নজরুল কেন জাতীয় কবি

ফাহমিদ-উর-রহমান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

একজন কবির সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষা দিয়েই তিনি তার পাঠককে সচকিত করেন। শিল্পীর পরিচয় যেমন তার গায়কীতে, তেমনি কবির পরিচয় তার ভাষারীতিতে। বাংলা সাহিত্যের দুই প্রধান কবি মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই প্রচলিত ভাষাররীতিকে দুমড়ে মুচড়ে নিজেদের প্রতিভা ও মানসিকতা প্রকাশের উপযোগী ভাষা হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন।

> এর পরবর্তীতে আবির্ভাব নজরুল ইসলামের। তার কাব্যভাষা নির্মাণের আয়োজনটা আরো অনন্য। অনন্য বলছি এই কারণে যে তিনি শুধু ভাষার নতুন শরীর নির্মাণ করেননি, ভাষার নবনির্মাণের ভিতর দিয়ে তিনি এক ধরনের সামাজিক বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন। একজন কবি শুধু কবিমাত্রই নন, তিনি তার যুগের প্রতিনিধিও। নজরুল তার যুগের প্রতিনিধি হিসেবে তার সামাজিক দায়বদ্ধতার ব্যাপারটি উপেক্ষা করেননি। এর কারণ হচ্ছে নজরুল যে সম্প্রদায়ের ভিতর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক পরাজয়ের ক্ষোভকে তিনি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ধারণ করেছিলেন।

ভারতে মোগল রাজশক্তির অবক্ষয় এবং সিপাহী বিদ্রোহের পরাজয়ের ভিতর দিয়ে যখন মুসলিম সমাজের সবরকমের আশা-ভরসাই নিরাশার ধূলিতে ম্রিয়মান হয়ে পড়লো তখন থেকেই তাদের ভিতর এক ধরনের ক্ষুব্ধ বিবেক কাজ করে চলছিল।

তারপরে আমরা দেখেছি সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ শক্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পরও বাঁশের কেল্লা নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ জেনেও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এটুকু জানিয়ে দেয়ার জন্য যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জুলুম ও বেঈনসাফী আমরা মানি না। এ হলো বিদ্রোহের একটি দিক মুসলিম সমাজের ক্ষুব্ধ বিবেকের খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা মাত্র। বিদ্রোহের এই চরিত্রটি ছিল রাজনৈতিক। বিদ্রোহের একটি ধর্মীয় দিকও ছিল। সেদিকে এগিয়ে এসেছিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তিনি এমন এক আন্তরিক শক্তিতে ডাক দিলেন যে গ্রামের নিম্নবিত্ত চাষী পরিবারগুলো তাদের বিশ্বাসের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো। এই সচেতনতার সামনে সাম্রাজ্যবাদপোষিত অত্যাচারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাৎক্ষণিকভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিরোধের বেশ কিছুদিন পর এগিয়ে আসেন কাজী নজরুল ইসলাম, যিনি এক সাহিত্যিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তখনকার বাঙ্গালি মুসলমান সমাজ যে বিক্ষোভ-বিদ্রোহের মনোভাব বহন করে চলেছিলেন নজরুল ইসলাম সাহিত্যের ভাষায় তা রূপ দেন। এ কারণে তার বিস্তার ঘটে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়।

আধুনিক বাংলা ভাষা তৈরী হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতদের হাতে। সেই ভাষা বিকশিত হতে হতে রবীন্দ্রনাথ অবধি এসে এটি প্রমত্তা যৌবনা নদীর আকার নেয়। এতদিনে এই ভাষা সৃজনশীলতার ভার বহন করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু উপমহাদেশের মুক্তির উপযোগী ভাষা কিংবা ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত বাঙালি মুসলমান সমাজের বেদনা প্রকাশের উপযোগী এই বাংলা ভাষা ছিল না। উপমহাদেশের মুক্তির জন্য স্বাধীনতা ও মুক্তির ভাষা উচ্চারণকারী কবির নাম হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম। আধুনিক বাংলা ভাষায় তিনি যেমন প্রথম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কবি, একই সাথে তিনি মুসলিম রেনেসাঁর কবি। আবার

অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও কবি।

ফোর্ট উইলিয়ামী পণ্ডিতদের কল্যাণে বাংলা ভাষার মধ্যে যে রূপান্তর এসেছিল সেই ভাষারীতিতেই তৈরী হয়েছিল ঊনিশ আর বিশ শতকের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলো। কিন্তু সে ভাষারীতিতে অধিকাংশ বাংলাভাষী মুসলমানের সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেনি। সে দায়িত্ব বর্তেছিল নজরুলের উপর। সচরাচর সাহিত্য সমালোচকরা বলে থাকেন নজরুল বাংলা ভাষায় এন্তার বাঙালি মুসলমানের প্রতিদিনের ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দকে ব্যবহার করেছেন। এরকম ব্যবহারতো সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলালরাও করেছেন। কিন্তু তাদের ব্যবহার ছিল নিছক রুচি পাল্টানোর মতো ব্যাপার। নজরুলের আরবি-ফারসি ব্যবহারের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় অঙ্গীকার। তিনি যেসব ইসলামী সংস্কৃতি সংলগ্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন মনে হয় এগুলো যেন তার সত্তার গভীর থেকে উঠে এসেছে। একেবারে ভিতর থেকে উঠে না আসলে মাতৃভাষার মতো এসব শব্দগুলো এতো স্বাভাবিকভাবে তার সৃষ্টিতে বিচরণ করতে পারতো না। কাজী নজরুলের মধ্যে কাজ করেছিল একটি ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধ। ঐ কর্তব্যবোধের দায় থেকে তিনি তার বিশিষ্ট কাব্যভাষা নির্মাণ করতে গিয়ে তাকে যেমন নিজের প্রবল ভাষাজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে তেমনি দ্বারস্থ হতে হয়েছে অতীতের পুঁথি সাহিত্যের ভাণ্ডারের। নজরুল পুঁথি লেখেননি, পুঁথি সাহিত্যের নবজীবন দান করেছেন।

পলাশীর বিপর্যয়ের পর যখন বাঙালি মুসলমানরা গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হলেন এবং এর অব্যবহিত পর ফোর্ট উইলিয়ামের সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতরা যখন বাংলা ভাষা থেকে যবন উৎখাতে আত্মনিয়োগ করলেন তখন তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন এই পুঁথির ভাষার মধ্যে। বাংলার শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মুসলমান জনগণের জীবন জিজ্ঞাসা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচরণ, রসপিপাসা এসব পুঁথিসমূহের উপজীব্য বিষয় হয়েছিল। বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক যোগসূত্র হিসেবে এই বিশেষ ভাষাটি সেদিন ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিল। নজরুল এই ঐতিহাসিকতার পরম্পরাকে অস্বীকার না করে নিজের সৃষ্টির সাথে একে যুক্ত করেছিলেন। নজরুলের আগেও অনেক মুসলিম কবি-সাহিত্যিক এসেছিলেন। তারাও বাংলা ভাষায় নানা গদ্য-পদ্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পর তারা গ্রহণ করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম সৃষ্ট ভাষার প্রকাশভঙ্গিটিকে। ঐ ভাষায় তাদের সৃষ্ট সাহিত্য যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা এটা ছিল না। তাই এটা বাঙালি মুসলিম চিত্তে আশানুরূপ দোলা দিতে পারেনি। ঊনিশ শতকের সবচেয়ে শক্তিমান মুসলিম কথাশিল্পী মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু পুঁথি সাহিত্য থেকে উপজীব্য গ্রহণ করলেও কলকাতার সেই নগরলালিত ভাষাটিতেই তিনি এটি রচনা করেছিলেন। বিষাদ সিন্ধুর অভাবিত জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে মুসলিম সমাজে পুঁথির প্রভাব কতোটা ব্যাপক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিষাদ সিন্ধু পড়ে মন্তব্য করেছিলেনঃ এই লেখকের রচনায় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেশি পাওয়া যায় না। এটাই গ্রন্থ রচনার সবচাইতে বড় প্রশংসা বলে সেদিনের মুসলমান লেখকেরা কবুল করে নিয়েছিলেন।

> কিন্তু কাজী নজরুলের ব্যাপারে ঘটলো অন্যরকম ব্যাপার। তিনি কলকাতাকেন্দ্রিক ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করলেও ঐ ভাষাটিকে তিনি শক্তভাবে মোচড় দিতে পেরেছিলেন। তার রচনায় আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দগুলোর শৈল্পিক ব্যবহার এক অসাধারণ মাত্রা অর্জন করলো, অন্যদিকে গভীর প্রাণোচ্ছ্বাসে বাংলা ভাষা জেগে উঠলো। এটা কেন ঘটেছিল, নজরুল কেন এ সব শব্দের ব্যবহার করেছিলেন তার তিনি কৈফিয়াৎ দিয়েছেন বড়র পিরীতি বালির বাঁধ প্রবন্ধে। এখানে তিনি লিখেছেন বিশ্বে কাব্যলক্ষীর একটি মুসলমানী ঢং আছে। ঐ মুসলমানী ঢংটা তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন এবং সে কাজে তিনি অভূতপূর্ব সফলতা পেয়েছিলেন। তিনি তার সৃষ্টিতে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ নিয়ে এসেছিলেন। সেটা তিনি গোপন করতে চাননি। সেটা যদি কারো নাসারন্ধ্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তাতেও তিনি কুপিত হননি। কারণ শেষ পর্যন্ত একটি সমাজকে, তার আত্মপরিচয়কে তো ফুটিয়ে তুলতে হবে। কলকাতাকেন্দ্রিক পণ্ডিতরা যতোই নাসিকা কুঞ্চন করুন না কেন, বাঙালি মুসলমানের ভাষা বাংলা ভাষারই একটি রূপ এবং এটা এই সমাজের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতাসমূহকে নিবিড় যত্নের সাথে প্রকাশ করেছে। শেষ পর্যন্ত নজরুলের এই যাবনী মিশাল ভাষাভঙ্গিকে পণ্ডিতকুল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

নজরুলের কাছে বাঙালি মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বড় ঋণ হচ্ছে, নজরুল তাদের হীনমন্যতা ছুড়ে ফেলে তাদের সামাজিক ভাষাকে, সংস্কৃতির ভাষাকে সাহিত্য সৃষ্টির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মুসলমান লেখকরা যে যাবনী মিশাল ভাষা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতেন, নজরুল তাদেরকে মুক্তি দিয়ে ও বাঙালি মুসলিম পাঠকদের প্রাণের আবেগকে অর্গল মুক্ত করে ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছেন।

বাঙালি মুসলিম পাঠকরা নজরুলের লেখায় তাদের প্রাণের স্পন্দন শুনেছিল। ভাষা ও সংস্কৃতির জাগরণের ভিতর দিয়ে একটি

জাতির জাগরণ ঘটে। নজরুল বাঙালি মুসলমানের ভাষাকে পুনঃনির্মান করে তাদের জাগরণের পথকে উন্মুক্ত করে দেন ও তাদের আত্মপরিচয়কে শনাক্ত করেন।

কাজী নজরুল ইসলাম অসংখ্য ইসলামী বিষয় নিয়ে কবিতা, গান লিখেছেন। এটা কোনো উদ্দেশ্যহীন খাপছাড়াভাবে তিনি করেননি। নজরুল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বাঙালি মুসলমানের ভাষাকে পুনঃনির্মাণ করেছেন। তেমনি যেসব বিষয় মুসলমানদের প্রিয়, যেগুলো নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়ে উপস্থাপন না করলে যেসব বিষয় আত্মাকে নাড়া দিতে পারে না, সেসব বিষয় তিনি বাংলা সাহিত্যে উপস্থাপন করলেন। তার রচিত মোহররম, কোরবানী, ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম, উমর ফারুক এসব কারণেই তৈরী হয়েছে। তিনি কুরআনের আংশিক অনুবাদ করেছেন। রাসূলের কাব্য জীবনী লিখেছেন। প্রচুর পরিমাণে ইসলামী গানও তিনি একই উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন। হাফিজ, খৈয়াম অনুবাদ করেছেন। শুধু তাই নয় বাংলা সঙ্গীতের জগতে তিনি আরবি-ফারসি সুরের ধারাও নিয়ে এসেছেন। বাঙালি মুসলিম সমাজে যে হীনমন্যতাবোধের শিকড় প্রোথিত হয়েছিল তার মূলে আঘাত করে তিনি তাদের বিপুল প্রাচুর্যময় ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। তার সাধনার ভিতর দিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজ একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছে। বলা চলে আজকে যে বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতির আধুনিক রূপটি এটা নজরুলের হাতেই কতকটা তৈরী হয়েছে। বাঙালি মুসলিম সমাজ সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে নজরুলের মতো আর কারো কাছে এতো ঋণী নয়। এই কারণেই তিনি আমাদের জাতীয় কবি।

প্রখ্যাত সংস্কৃতি বিশ্লেষক আবুল মনসুর আহমদ নজরুলের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা চিন্তা করেই ১৯৪০-এর দশকে বলেছিলেনঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর বিশ্বে কতবার শারদীয়া পূজায় আনন্দময়ী মা এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ-মোহাররমের চাঁদ ওঠেনি। সে চাঁদ ওঠাবার ভার ছিল নজরুল ইসলামের উপর। এতে দুঃখ করবার কিছু নাই, কারণ এটা স্বাভাবিক, কাজেই কঠোর সত্য। (বাংলাদেশের কালচার)

যাই হোক নজরুলকে বাঙালি মুসলমানের জাতীয় কবি বললে অনেকে সাম্প্রদায়িকতা ও পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পেতে পারেন। কিন্তু নজরুলই একমাত্র কবি যিনি হিন্দু-মুসলমানকে এক সাথে হ্যান্ডশেক করাতে চেয়েছিলেন, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান ইসলামী সঙ্গীত-শ্যামা সঙ্গীত, হামদ-নাত-গজল, কীর্তন, খালেদ-ভীমকে একসাথে মেলানোর এক রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন চারণ কবির মতো উদার। কবিতা লিখতে যেয়ে হিন্দু আর মুসলমান পূরাণ তার কাছে সমান তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। “পিনাক পানির ডম্বরু ত্রিশূল ধর্মরাজের দণ্ড” এরকম একটি পংক্তি যে কোনো মুসলমান কবি দূরে থাক, কোনো হিন্দু কবির পক্ষেও রচনা করা সহজ নয়। শুধু তাই নয়, কবি তার পারিবারিক জীবনেও এই ঐকাত্মের সাধনা করেছিলেন। সুভাষ চন্দ্র বসু তাকে জাতীয় কবি করতে চেয়েছিলেন, তার গান গেয়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তারপরেও ইতিহাস কিন্তু নজরুলের মতো এগোয়নি। সুভাষের মতো করেও না। ভারত ভাগ হয়ে গিয়েছে, বাংলা ভাগ হয়ে গিয়েছে। নজরুল জাতীয় কবি হয়েছেন পূর্ববঙ্গের, পশ্চিমবঙ্গের নয়। এটাই ইতিহাসের রায়। এ রায় নিষ্ঠুর হলেও বাস্তব এটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

সূত্রঃ বুকমাস্টার প্রকাশিত “**বাংলাদেশ জিন্দাবাদ**” গ্রন্থ

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)